প্রদীপ্ত স্মৃতির আবহে সাহিত্যিক যশোদাজীবন

পূর্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়

ডাকযোগে 'শৈলী ২৬-২৭' হাতে পেলাম। পাতা উলটিয়েই বুকের রক্ত ছলাত করে উঠল। মনের ভিতর বিষাদের একটা দমকা হাওয়া হাহাকার করে বয়ে গেল। শৈলী কী নিদারুণ খবর নিয়ে এল। যশোদাজীবহন ভট্টাচার্য আর নেই। স্বজনবিয়োগের বেদনায় মনটা সারাদিন, সারারাত ভারাক্রান্ত হয়ে থাকল। অনার্স ক্লাসে পড়াতে গিয়ে বারবার একাগ্রতা ভেঙে যাচ্ছিল। অমলেন্দুবাবুকে রাতে ফোন করলাম। উনি যশোদাজীবনবাবু সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করতে বললেন।

অতীতের সেই স্বর্ণময় দিনগুলির কথা মনে পড়লেই নস্টালজিয়ার আক্রান্ত হয়ে পড়ি। ধানবাদ থেকে পাটনায় এসে আরও বড়ো আকাশে র তলায় আরও বড়ো সম্ভাবনাময় জীবনের হাতছানিতে অনেক সম্মানজনক পথ পার হয়ে এসেছি। ভারতের প্রথম বাংলা অ্যাকাডেমি গড়ার প্রথম স্বপ্ন দেখেছিল যে তিনজন, এই অধম তাদের একজন। পরে অ্যাকাডেমির অধ্যক্ষ হওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে। বিহার প্রগতিশীল লেখক সংঘের সহ - সভাপতি, তারপর সভাপতিমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে কত বড়ো বড়ো হিন্দি লেখকদের সান্নিধ্য পাওয়া সম্ভব হয়েছে। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, নবেন্দু ঘোষ, বনফুল, সুভাষ সরকার, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, অন্নদাশঙ্কর, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, দেবকুমার বসু প্রমুখ অসংখ্য সাহিত্যিকের সঙ্গে ভাষা ও সাহিত্য আন্দোলনে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। কিন্তু পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে কাতরাস কলেজে যোগ দেওয়ার পর ধানবাদে প্রবাহ সাহিত্য সংসদের সেই প্রারম্ভিক দিনগুলোর বর্ণময় স্মৃতি এখনও ধূসর হয়ে যায়নি। তখনকার বড়ো প্রাপ্তি যশোদাবাবুকে সাহিত্য - সঙ্গী হিসেবে পাওয়া। যদিও যশোদাবাবু বয়সে আমার চেয়ে অনেক বড়ো ছিলেন তবুও আমরা বন্ধুর মতো ছিলাম। সাহিত্যসাধনা সেই সোনালি সম্পর্ক সূত্র।

প্রবাহ সাহিত্য সংসদের জন্ম মনাইটাড়ে। স্টেট ব্যাংক্ক ও বরোদা ব্যাংকের কয়েকজন সাহিত্য - সংস্কৃতি প্রেমী যুবক এর গোড়াপত্তন করে একটা হাতের লেখা পত্রিকা বের করতেন। তাঁরা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে টেনে নিয়ে এসে আমাকে ও যশোদাবাবুকে যুগ্ম - সম্পাদক করে দিলেন। মনাইটাড়ে সান্যালবাবুদের বাড়িতে এক মেসঘরে তাঁরা থাকতেন। আদিত্যবাবু, মৃণালবাবু আরও কত সাহিত্য - মুগ্ধ নীরব কর্মী ছিলেন। প্রথম সংখ্যাটি বড়োই অগোছাল হয়েছিল। ব্যবস্থাপকদের উপর যশোদাবাবু খুব বিরক্ত হলেন। উনি ছিলেন খুব খুঁতখুঁতে। তাঁর মতে পত্রিকা হবে ছিমছাম, তার সর্বাঙ্গে থাকবে স্মার্টনেসের ঝলকানি আর লেখাগুলি হবে সুর্নিবাচিত। অক্ষম লেখা, হাত পাকানো লেখা উনি একদম পছন্দ করতেন না। আমিও তাঁর সঙ্গে একমত হলাম। কিন্তু আমরা তো নিমন্ত্রিত অতিথি। যাঁরা আমাদের আদর করে, সম্মান দিয়ে ডেকে এনেছেন তাঁদের কিছু নিজস্ব পছন্দ - অপছন্দ আছে। তাছাড়া কিছু অসাহিত্যিক বাধ্যবাধকতা থাকতে পারে। যশোদাবাবু আপস করতে রাজি ছিলেন না। আমি ধীরে চলার ট্র্যাটেজি মেনে চলতে চাই, উনি চান না। আমায় বললেন— আপনি তো মশাই সাহিত্যের অধ্যাপক। আপনি ভালোভাবেই জানেন ছোটোগল্প ও কবিতার প্রকৃত স্বরূপ। শিব গড়তে গিয়ে বাঁদর গড়লে আপনি কি মেনে নেবেন? স্ট্যান্ডার্ড দেখতে হবে না? আরেকটা স্কুল ম্যাগাজিন বের করার মতো সময় কি আমাদের আছে? আমি বললাম—ওদের সেন্টিমেন্টকে আঘাত না দিয়ে আলতোভাবে এমন একটা উপায় বের করতে হবে যাতে এই সৎ প্রচেষ্টাকে একটা সুব্যবস্থিত, সুশৃঙ্খল লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যাওয়া যায়। সেটা করতে হবে ব্যবস্থাপকদের কনফিডেন্সে নিয়েই। মাও - সে -তুং কথিত 'এক ঘায়ে শেষ করের দেওয়ার নীতি ও ধীরে ধীরে রোগ নিরাময়ের নীতি'র কথা বললাম। একথাও বললাম আমাদের কবি বলেছেন— 'যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখো তাই, মিলিলে মিলিতে পারে অমূল্য রতন'। আমরা রেডিমেড লেখক এখানে পাব না। সম্ভাবনাময় মানুষ খুঁজে আমাদের লেখক তৈরি করে নিতে হবে। আমি রামকৃষ্ণ মিশনে মানুষ হয়েছি। বিবেকানন্দের মত ছিল প্রতিটি মানুষের মধ্যে অপার সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে। প্রয়োজন, মালির মতো যত্ন করে নার্সিং করে সেই সম্ভাবনাকে জাগিয়ে দেওয়া। যশোদাবাবু বললেন— 'সেই চেষ্টা করতে গেলে একটা পুরো জীবন খরচ হয়ে যাবে। শেষে হয়তো দেখব কাজের কাজ কিছুই হল না। একটা স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকা বের করতে গেলে কিছুটা শক্ত হাতে হাল ধরতেই হবে। শেষ পর্যন্ত আমার সঙ্গে তাঁর একটা মাঝামাঝি জায়গায় রফা হল। আমরা স্থির করলাম। স্থানীয় প্রতিভা খুঁজে বের করতে হবে। তারপর তাকে ধীরে ধীরে ট্রেনিং দিয়ে তৈরি করে নিতে হবে। আমরা স্থির করলাম সাহিত্যসভার আয়োজন করা হবে, সেখানে স্বরচিত গল্প, কবিতাপাঠের ব্যবস্থা করা হবে। সভায় যে লেখাগুলি পড়া হবে, তার সমীক্ষা তক্ষুনি করা হবে। শ্রোতাদের মতামত জানতে চাওয়া হবে। লেখককে বলা হবে যে সব সমালোচনাকেই যেন খেলোয়াড়ি মনোভাব নিয়ে গ্রহণ করেন। এটা আমাদের মতামত প্রকাশের মুক্তমঞ্চ। এরপর যে লেখা রসোত্তীর্ণ হবে, সেটি পত্রিকার জন্য চেয়ে নেওয়া হবে। অর্থাৎ সরাসরি কেউ পত্রিকায় লেখা ছাপার জন্য দেবেন না। শ্রোতাদের মতামত শোনার পর আমি ও যশোদাবাবু সাহিত্যের নন্দনতত্ত্বের সাহায্যে ভুলত্রুটির বিচার - বিশ্লেষণ করতাম। সকলের মনে এই বিশ্বাসটুকু জাগাতে পেরেছিলাম যে আমরা ধ্বংসাত্মক সমালোচনা করি না, আমরা লেখকদের হিতৈষী। আমরা চাই লেখার মান উন্নত হোক।

এই পদ্ধতিটি খুব ফলপ্রসূ হয়। লেখকরা বুঝতে পারলেন— অশিক্ষিত পটুত্ব দিয়ে বেশিদূর এগোনো যায় না। গল্প, কবিতা লেখার কিছু টেকনিক আছে যা শিখতে পারলে নিজেরই উপকার হয়। আমরা কিছুদিনের মধ্যেই একঝাঁক সম্ভাবনাময় লেখক তৈরি করে ফেললাম। শিবানী দাস, রোহিনীকুমার দাস, রমেন বন্দ্যোপাধ্যায়, জামাডোবার অসীম চট্টোপাধ্যায়, ত্রিপুরারি চক্রবর্তী (ছদ্মনাম লিটন মুন্সি), শচীনকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ আরও অনেকে। এঁদের মধ্যে শচীনবাবু এখন লব্ধপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক। তাঁর চার - পাঁচটি ছোটোগল্পের বই ইতিমধ্যেই বেরিয়েছে, এঁর দক্ষ সম্পাদনায় বের হয়েছে। শচীনবাবুর সাহিত্য জীবনের প্রথম গল্প— 'বেইমান' প্রবাহে বের হয়। রমেন বন্দ্যোপাধ্যায় ভাবতেই পারেননি তাঁর লেখা অমৃত-র মতো পত্রিকায় ছাপা হবে, তাঁর লেখা গান আকাশবাণী থেকে গাওয়া হবে। রোহিণীবাবু এখন বার্ধক্যজনিত রোগে কাবু হলেও কলমের গতিকে কেউ কাবু করতে পারেনি। তাঁর দুটো বড়োসড়ো উপন্যাস ও দুটি কবিতা সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। এখনও লিখে চলেছেন। তাঁর একটা চাপা অভিমান আছে। এখনকার পত্রিকা প্রকাশকরা নিজেদের নিয়েই মত্ত থাকতে ভালোবাসেন, ঐতিহ্যের দিকে তাকাতে চান না। এঁরা সেই লেখকদের খাতির করেন যাঁরা বিনিময়ে এঁদের লেখা ছাপবেন। রোহিণীবাবু চিঠি দিয়ে, ফোন করে এখনও আমার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছেন। এমনকী বড়ো ধরনের অপারেশনের আগে একটা মর্মস্পর্শী চিঠি সেই সঙ্গে একটি সদ্য লেখা কবিতা আমার নামে পোস্ট করেন। হয়তো তাঁর মনে আশঙ্কা ছিল। শচীনবাবুর সঙ্গে কলকাতায় কোনও সাহিত্য সম্মেলন অথবা বইমেলায় দেখা হলে পরম আদরে জড়িয়ে ধরতে দ্বিধাবোধ করেন না। প্রবাহ যেন একটা লেখক পরিবারের নাম ছিল, যার স্নেহময় অভিভাককের নাম যশোদাজীবন ও পূর্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়।

এইভাবে কাজ করে সোনার ফসল গোলায় তুলতে পারার সাফল্যে যশোদাবাবু ভীষণ খুশি হলেন। তাঁর উৎসাহ বেড়ে গেল। আমাদের

আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়ে ধানবাদ ডি আর এম অফিসের অফিসার দনুজবাবুর দুই ভাই আমাদের প্রস্তাব দিলেন তাঁদের প্রেস থেকে যতখানি সম্ভব সস্তায় পত্রিকা ছেপে দেবেন। ঝড়িয়া রাজগ্রাউন্ডে তাঁদের প্রেস ছিল, নাম— রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং। তাঁরা এও অফার দিলেন প্রেসের প্রাঙ্গণে আমাদের বসার এমন উপযুক্ত ব্যবস্থা করে দেবেন যাতে আমরা সাহিত্যের আড্ডা বসাতে পারি। সেইসঙ্গে ফ্রি চা ও টাও থাকবে। যত দরকার নাকি তত সাপ্লাই পাওয়া যাবে। এমন লোভনীয় অলৌকিক ব্যবস্থায় আমরা স্বর্গ হাতে পেলাম। আমি ও যশোদাবাবু প্রতিদিন সেখানে যেতাম। ওই আড্ডাটা খুব ফলপ্রসূ হয়। ওখানে আমরা অনেক নতুন সাহিত্যিক বন্ধু পেয়ে যাই। কেউ কেউ আমাদের সাহিত্য আড্ডায় আসতেন শ্রোতা হয়ে। যশোদাবাবু প্রস্তাব দিলেন মাসে অন্তত একবার ধানবাদ জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে সাহিত্যসভার আয়োজন করা হবে। শচীনবাবুর আমন্ত্রণে লয়াবাদ, সেন্দ্রা কোলিয়ারিতে গেলাম। সেদিন আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামল। থামলই না। শচীনবাবু অনেক চেষ্টা করে একটা ট্যাক্সিওয়ালাকে রাজি করিয়ে যশোদাবাবু ও আমাকে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। মনাইটাঁড়ে সাহিত্যসভা হয়েছে বহুবার। সিন্দ্রি ও মাইনিং রিসার্চ স্টেশনেও হয়েছে। ড. আদিনাথ লাহিড়ির আত্মীয় তীর্থজ্যোতি ভাদুড়ি স্বরচিত গল্প পড়তে আসতেন। শ্যামল দাস ও শিবানী দাসকে সেখানেই আমরা আবিষ্কার করি। এই সাফল্যে যশোদাবাবু খুশি হয়ে মেতে উঠলেন। রমেনবাবুর গল্প একটু মাজাঘষা করে উনি অমৃত পত্রিকার ধারাবাহিক ছাপা হচ্ছে। পরের সেই উত্তর মেঘ বই আকারে বের হল। খুব সুন্দর প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন দুর্গাপুরের বাদল ভট্টাচার্য। প্রবাহেরও একটা ব্যঞ্জনাময় প্রচ্ছদ তিনি এঁকেছিলেন, বিদগ্ধমহলে যার প্রশংসা হয়েছিল। মনে পড়ে, প্রবাহের একটি শারদ সংকলন (১৯৬৮)-এ প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন শিল্পী দেবব্রত মুখোপাধ্যায়। ওই সংকলনে লেখকদের যেন নক্ষত্রের হাট বসেছিল। তারাশঙ্কর, কালিদাস রায়, সুভাষ সরকার, গীতিকার পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, মনীশ ঘটক, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, তরুণ সান্যাল, রবীন সুর, রণজিৎ দেব, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত (সম্প্রতি সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পেলেন), ওপার বাংলার কবি আশরাফ সিদ্দিকি, আবদুল সাওয়ার প্রমুখ আরও অনেকে। তখনকার বাংলাসাহিত্যে এঁরা পুরোভাগে সসম্মানে বিরাজ করছেন। এসবই যশোদাবাবুর দৌলতে সম্ভব হয়েছিল। প্রবাহ তৎকালীন পূর্ববাংলায় পাঠানো হত। তখন পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী বজ্রকঠিন মুষ্টিতে পূর্ববাংলার কণ্ঠরোধ করার দানবীয় চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সাহিত্য - সংস্কৃতি আদানপ্রদান বন্ধ। কিন্তু সৃষ্টি মুক্তধারা রোধ হল না। ওপার বাংলা থেকে এপারে স্মাগল করা গল্প ও কবিতা আসছে। সেই চোরাইমালের একাংশ আমরা ধানবাদে বসে পেয়ে যাচ্ছি। ছাপা হচ্ছে পূর্ব ও পশ্চিম শিরোনামে। যাঁদের লেখা ছাপা হল তাঁদের সৌজন্য কপি স্মাগল করে তাঁদের হাতে পৌঁছে দেওয়া হত যশোদাবাবুর কলকাতার লেখক বন্ধুদের মারফত। ভাবা যায়! স্বপ্নকথার মতো শোনায়।

আজও মনে আছে, প্রবাহ পত্রিকা নিয়ে আমি ও যশোদাবাবু কলকাতায় গেলাম। অ্যালবার্ট হল, কফি হাউসে গেলাম। অসংখ্য লেখকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন যশোদাবাবু। সেখানেই 'পরিচয়' পত্রিকার লেখকদের সঙ্গে আলাপ হল। প্রবাদপ্রতিম সম্পাদক দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাপ হল। আমিও দীপেনদার দৌলতে পরিচয় পত্রিকার লেখক হয়ে গেলাম। হালিশহরে যশোদাবাবু নিয়ে গেলেন, সমরেশ বসুর বাড়িতে গেলাম, তাঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন যশোদাবাবু। আলাপ হল অসাধারণ প্রাবন্ধিক অধ্যাপক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। রামপ্রসাদের ভিটে দেখলাম, সেইসঙ্গে আলাপ হল বিদগ্ধ মানুষদের সঙ্গে।

বিমল কর পঞ্চাশের দশকে কয়েকজন সম্ভাবনাময় যুবা লেখকদের নিয়ে একটা অভিনব ছোটোগল্প আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। 'গল্পহীন গল্পে'র আন্দোলন, চেতনাপ্রবাহপদ্ধতিতে লেখা পরীক্ষা - নিরীক্ষামূলক গল্প আন্দোলন সাহিত্যে খুব সাড়া জাগিয়েছিল। শীর্ষেন্দু, দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেশ রায় প্রমুখ গল্প লেখকরা তখন সামনের সারিতে এসে দাঁড়ান। যশোদাবাবু সেই আন্দোলনের একজন। শিলালিপি পত্রিকায় বিমল কর স্মৃতিচারণে যশোদাবাবুর কথা লিখেছেন। এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনা উল্লেখ করার লোভ সামলাতে পারছি না। বিমল করকে পাটনায় আমরা বাংলা নববর্ষের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি করে এনেছিলাম। আমি বিমল করকে জিজ্ঞাসা করি উনি ধানবাদে কোথায়, কখন ছিলেন। বিমল কর আমাকে বলেন, খুব ছোটোবেলা উনি তেঁতুলতলায় ছিলেন। বিমল করের প্রথম গল্প 'বরফ সাহেবের মেয়ে' প্রকাশিত হওয়া মাত্রই সাড়া জাগিয়েছিল। ধানবাদ শহরে হরিগোপাল মজুমদার রোডের একটি ভাড়াবাড়িতে। পরে আমরা মনাইটাঁড়ে নিজেদের বাড়ি তৈরি করে চলে আসি। যাই হোক, পাটনায় বিমল করকে জিজ্ঞাসা করে যশোদাবাবুর সম্পর্কে তাঁর মতামত জানবার চেষ্টা করি। বিমল কর যশোদাবাবুর প্রশংসা করেন। তবে বলেন, কলকাতা থেকে দূরে থাকার জন্য এবং যশোদাবাবু দ্রুত লেখায় অভ্যস্ত লেখক না হওয়ার জন্য, যথেষ্ট প্রচারর পাননি। আমার মনে আছে, যশোদাবাবু বলতেন, কোনও কোনও লেখক বিপুল হারে গল্প, উপন্যাস উৎপাদন করে চলেছে, কোয়ালিটির কথা না ভেবেই। উনি সেই পাইকারি রেটে উৎপাদন পন্থাটিকে অপছন্দ করেন। সেইসময় আমি ঘনঘন জামাডোবায় যশোদাবাবুর বাড়ি যেতাম। রমাদির সঙ্গে আলাপ হয়। যশোদাবাবুর দুই মেয়ে তখন খুব ছোটো। গেলেই বউদি খুব যত্ন করে লুচি, মিষ্টি খাওয়াতেন। পুরানো সেই দিনের কথা সে কী ভোলা যায়?

পরে যখন আমি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিলাম তখন ধানবাদে গেলে মাঝে মাঝে যশোদাবাবুর সঙ্গে দেখা করতাম। তখন উনি কর্মধর্ম নিয়ে ব্যস্ত আছেন বলেছিলেন। লেখা চাইলে বলতেন খুব কম লেখেন। দেশ পত্রিকায় যখন আমার 'মাফিয়া পুরাণ' বের হল তখন উনি আমাকে বলেছিলেন ধানবাদের মাফিয়াদের নিয়ে উপন্যাস লিখতে। উনি নিজে লিখতে পারবেন না এই কারণে যে ওঁর গল্পবর্জিত গল্পরীতিতে এই ধরনের লেখা খাপ খাবে না। উনি ওই রীতিপদ্ধতিটা বদলাতে চাননি। তার ফলে উনি কখনও যে জনপ্রিয় লেখক হবেন না একথা আমাকে বারবার বলেছেন। গল্পখাদক পাঠক তাঁকে পছন্দ করবে না একথা তিনি জানতেন। যশোদাবাবুর কবিতার হাতও খুব ভালো ছিল।

শেষের দিকে উনি ধর্মসাধনার দিকে ঝুঁকে পড়েন। লেখা আরও কমিয়ে দেন বা কমে যায়। পাটনার বাংলা অ্যাকাডেমি গঠনের পর আমরা বিহারের গল্প লেখকদের গল্প সংকলন বের করব ভেবেছিলাম। কিন্তু যশোদাবাবু আগ্রহ দেখাননি। তার আগে অবশ্য বাংলা অ্যাকাডেমি থেকে বিহারের কবিদের কবিতা সংকলন বের করেছি। তাতে যশোদাবাবুর কবিতা ছিল। জীবনানন্দের পরাবাস্তবতাগন্ধী কবিতাগুলি পড়লে ওই পঙ্‌ক্তিগুলি অনিবার্যভাবে পাঠকের বিশ্লেষণী চেতনায় হানা দেয়। যশোদাজীবনের অনেক গল্পে ওই আমেজ পেয়েছি। আমি খুব উপভোগ করতাম ওই রীতিপদ্ধতি। তাঁর অনেক গল্পের প্রথম শ্রোতা ছিলাম। আমার সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলোচনার পর কোনও কোনও জায়গায় আবার কলম চালিয়েছেন। মগ্নচৈতন্যের রহস্যময় গহ্বর থেকে সন্তর্পণে উঠে আসা ভাষার কুহকে আমি মুগ্ধ হলেও সবাই হবে, এমনটা আশা আমরা দুজনেই করিনি। আমি অনেকবার তাঁকে ইঙ্গিত দিয়েছি এবার অন্যপথে হাঁটুন। এবার গল্পনির্ভর গল্প লিখুন। আর সেই গল্পে থাকুক মানভূম অঞ্চলের মাটি, মানুষও অবহেলিত সমাজের স্পর্শ। মাফিয়ানিয়ন্ত্রিত মানভূমের পাথরচাপা বেদনার কাহিনি বাঙ্ময় হয়ে উঠুক, লোকায়ত জীবনের স্বাদগন্ধ বাংলা সাহিত্যের নতুন দিগন্ত খুলে দিক। মানুষটা ভিতরে ভিতরে রোম্যান্টিক ছিলেন, সমাজবাস্তবতার প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল কম। ধানবাদে তাঁর মনের মতো সাহিত্যিক সঙ্গী ছিল কম। জানি না মনের কোন অভাবকে ভরাট করতে প্রথাশাসিত ধর্মকর্মের পথকে শেষ জীবনে আঁকড়ে ধরলেন। থাক সে কথা। 'কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে...'